# পরিবিষয়ী

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

## গাত্রমিথের মশলা

মড়ার গায়ে এক বিশেষ মশলা মাখিয়ে মিশরের মামি তৈরি করা হতো, যাতে সে দীর্ঘায়ু হয়। মিথ বেঁচে থাকে জনকৌতূহল ও রটনার এইরকমই কোনো মশলা মেখে। তার খুব কাছাকাছি গিয়ে ছুঁয়ে দেখলে, নিশ্বাস নিলে সেটা বোঝা যায়। অনেক সময় তথ্যচিত্র, জীবনী বা সাক্ষাতকার এই কাজটা করে - মিথের খুব কাছে গিয়ে বসে, তার কথা বলতে বলতে, তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে, আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নেয় তার প্রতিষেধক-খোলস। তখন আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা মন্ত্রমুগ্ধকর গানের স্বরলিপি লেখার মুহূর্ত।

যেমন মানুষটাকে দেখছি একেবারে ভোর থেকে। ছটার আগেই উঠলেন। রাতের পোশাক না ছেড়েই ওভারকোট জড়িয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। কয়েকটা নিশ্চুপ মিনিট। তারপর বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরের কোণে একটা ছোটো হলদেটে ওক কাঠের চেয়ারে বসলেন। একপাশে ওক কাঠের টেবিল। তার ওপর নানা আকারের সেরামিক রাখা, নানা আকারের উকো, ছেনি, বাটালি, অন্যান্য যন্ত্র, একটা কাঠের পাইপ এইসব। সাদা-নীল-সবজেটে ডোরাকাটা রাতের ফতুয়া আর পাজামা পরনে। কোলের ওপর তুলে নিলেন সেরামিক, তাতে যন্ত্রপাতি ঘষতে শুরু করলেন। গৃহ নিস্তব্ধ। দরজার কাছে কাকাতুয়া দাঁড়ে বসে ঘুমায়, একপাশে পাপোশের ধারে এখনো ঘুমিয়ে আছে তার পোষা লামা। এইফাঁকে ক্যামেরা ঘুরে বেড়ায় পাশের হলে, যেটা তার সেসময়ের গ্যালারি। ঘুরে বেড়ায় গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে থাকা অন্য যাদুঘরে। দেখায় চিত্রাঙ্কনের বাইরে ওর অন্যান্য শিল্প - যেমন শিকাগো শহরের রাস্তায় স্টিলের ভাস্কর্য, অ্যামস্টারডামের এক যাদুঘরে একটা বাঁদর যার গোটা শরীরটা গড়া বর্জ্যবস্তু দিয়ে আর মুখটা ৫০ দশকের ফোর্ড মডেলের একটা খেলনাগাড়ি দিয়ে তৈরি।

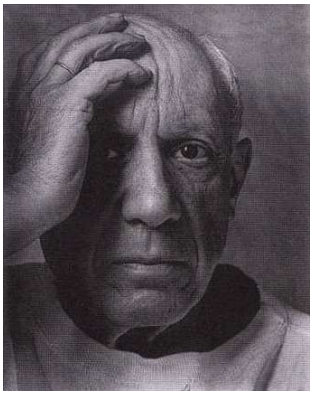

ক্রমশ সকাল সাড়ে নটা। স্ত্রী ঝ্যাকলিন একটা পাতলা প্লেটে করে প্রাতরাশ নিয়ে এলেন। একটা ফিনফিনে টাস্কান টোস্ট। জ্যাম লাগানো। সঙ্গে লেবু-চা, গ্রিন টি। খাওয়ার সময় চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। প্রাতরাশ টেবিলে গিয়ে একটু বসলেন বউয়ের সঙ্গে। টুকরো-টাকরা কথা। সবই শিল্প সংক্রান্ত, ফিল্ম বা সাহিত্য বিষয়ক। খবরের কাগজ দেখলেন এক ঝলক। জ্যামের জারের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে একটু তুলে নিলেন। তারপর আবার একটা অন্য রোব জড়িয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালেন কিছুক্ষণ। আড়মোড়া ভাঙা। একটু পায়চারী। অদূরে ফ্রান্সের প্রভাঁস অঞ্চলের বক্র চিরসবুজ জৈবতা মিঠে রোদের অল্প আঁচে আরামদায়ী। ব্যালকনির কাঁচের দরজা টেনে দিয়ে আবার এসে বসলেন ঐ চেয়ারে। স্ত্রী এসে বলাতে চেয়ারটা অল্প সরিয়ে নিলেন যাতে রোদ এসে পড়ে তার হাতের কাজের ওপর। বয়স নব্বই পেরিয়েছে সদ্য, তবু পিকাসোর হাতে যতি পড়েনি। রোদ এসে পড়েছে।

φ φ Ψ Ψ Δ Δ

কথাবার্তা গড়াচ্ছে, তিন চার জনের সাথে, কখনো হয়তো একইসাথে, সেটা বই পড়ে বোঝা যায় না। শেষের দিকে অধ্যাপক স্বপন চক্রবর্তীর সাথে এক ব্যক্তিগত কথোপকথন রয়েছে। এক কথোপকথন যা মিথের গায়ের সেই মশলার ঘ্রাণ ছড়িয়ে দিচ্ছে। উনি যেন খানিকটা আচমকাই বললেন -

'তুমি আমাকে বিনয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে পারো। আমার কোনো আপত্তি নেই। কেননা ওর বিষয়ে আমার কিছু বলা উচিত।.....

ওর বিষয়ে আমার কিছু বলা উচিত কেননা লোকে বিশ্বাস করে যে আমাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক ছিলো এবং শেষ পর্যন্ত আমি ওকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। তাই না ?'

*স্বপন - না, আমি কিন্তু এমন কিছু শুনিনি।*

'তাহলে তুমি কি শুনেছো ?'

*স্বপন - আমি শুনেছিলাম যে আপনাদের মধ্যে একটা মননশীল প্রেম গড়ে উঠেছিলো এক সময়ে। কিন্তু উনি সম্পূর্ণ ভারসাম্য রাখার মতো অবস্থায় ছিলেন না।*

'ও আমার প্রেমে কোনোদিনো পড়েনি। কোনোদিনই বিনয় আমায় ভালোবাসতো না। ....আমি ছিলাম একটা চরিত্র, আদল। ....একটা ফিগার মাত্র, সত্যি। ...'

φ φ Ψ Ψ Δ Δ

মিথ গড়ে ওঠে খানিকটা যেভাবে জমি, মাটি, ভূপ্রস্তর, জাতি, সংস্কৃতি বা ঢাকাই পরোটা। পলির ওজনে ভারবাহী নদী যেভাবে প্রস্তরের পর প্রস্তর উর্বর মাটি ফেলে ফেলে তাজা জমি নির্মাণ ক'রে ফেলে, যেভাবে প্রাঞ্জল পচনশীলতার উপ-উৎপন্ন হিসেবেই গড়ে ওঠে নতুন জমি, সেইভাবেই সমবেত মানুষের ধীরে জমানো, ধীরে পাল্টানো অভ্যাসমালা থেকেই জাতির সংস্কৃতি সঞ্চয় ; বহু মানুষের জমানো মননেচ্ছা, স্বপ্নপূরণের সামষ্টিক আকাঙ্খা, রটনা ও সংবাদপ্রবাহের ফিতে একটার পর একটা জড়ো করেই মিথ। তাকে ছাড়ানোর সময়ে তাই ঢাকাই পরোটা খাবার স্মৃতি এসে আচ্ছন্ন করে। ফিতে খুলে যায়, চুল খুলে যায় ; এক ঝলক গন্ধ ঝাপটা মারে আর খোলচ্যূত নতুনাবিস্কার বেরিয়ে এসে ভেঙে দেয় খোলের গোটা ধারণাটা।

দ্বিতীয় সারিতে বসে আছি ছিনে জোঁকের মতো। ওইরকম মন্ত্রমুগ্ধ এর আগে কখনো হইনি বোধহয়। মঞ্চের আলো কমিয়ে কবিতার আবহের সাথে মানানসই করে নেওয়া হয়েছে। একটা সোনালি আভায় মঞ্চের সকলের গায়ে হলুদ। সেই প্রথম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে দেখছি অত কাছে থেকে। তাঁর বয়স তখন কত হবে ? ৪৬ ? কবিতা পড়ার জন্য একটা চালসের চশমা এনেছেন, রূপোলি ফ্রেম, নাকের ওপর নামিয়ে পড়া। যদিও সৌমিত্র তখনো পড়ছেন না। পড়ছেন সে সন্ধ্যার কবি। পড়ছেন -

'জামায় রক্তের দাগ পিছু ফেরা বিপ্লবের মতো থাকে
জামা কতদিনে ছেঁড়ে ?'

সৌমিত্র বসেছিলেন মঞ্চে, লাফিয়ে উঠলেন। মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন বারবার। উফ ! কি লাইন ! কি সব লাইন ! পাশে বসা সন্তোষকুমার ঘোষও ছটফট করছেন। এক একটা কবিতা পড়া হচ্ছে আর ১৭ বছরের আমি লোভী চক্ষে পরের কবিতার জন্য কুকুরের মতো কাতরতা দেখাই দ্বিতীয় সারি থেকে। কিন্তু আশপাশের দর্শক, শ্রোতা ! হায় ! দর্শক যেমন হয়, শ্রোতা যেমন হয়, কবিকে চেনে তার একটি মাত্র পংক্তি বা তার একটি মাত্র কবিতা দিয়ে। এক একটা কবিতা যেই শেষ হচ্ছে অমনি পেছন থেকে পাশ থেকে উঠছে সরব অনুরোধ - 'অ ব নী বা ড়ি আ ছো হয়ে যাক..... অ ব নী বা ড়ি আ ছো '

অনুষ্ঠানের নাম 'শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে একটি সন্ধ্যা'। কারা আয়োজক ছিলেন আজ আর মনে নেই। খুব সম্ভবত ১৪ই নভেম্বর, শনিবার, ১৯৮১, কলকাতার আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস-এ সন্ধ্যার অনুষ্ঠান। শক্তির বয়স ৪৭-৪৮, তখনো তাঁর কবিতা মরেনি। আপন ক্লিশের আগাছায় ছেয়ে যায়নি। তখনো শক্তি দুর্দান্ত ! আর আমি তার ভয়ংকর অন্ধ কিশোর ভক্ত। এতটাই, যে সুযোগ পেলে, বাসে ট্রামে দেখে ফেললেও সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অনুসরণ করি। স্কুলের বন্ধুরা টিজ করে। চিমটি কাটে। কলকাতায় চারপাশে মিষ্টি কিশোরীরা গুঞ্জন করিতেছে, আমাদের কো-এড স্কুলের সর্বত্র তো বটেই, তাহার ঘনমধ্যে যথেষ্ট রোম্যান্টিক হওয়া সত্ত্বেও আমি প্রায় গুপ্তচরের মতো এক মধ্যবয়সী, ক্ষীণবপু, বিরলকেশ, প্রায়শ মাতাল ভদ্রমহোদয়ের পিছু লইয়া বেড়াই...এই সব নিয়েই হাসাহাসি। এইদিনের মাত্র কয়েকমাস আগেই খুব সামনাসামনি দেখা হয়েছে কবির সঙ্গে। একজনের বৈঠকখানায়। সে ঘরে কেবলমাত্র আমরা দুজন ছিলাম। কিন্তু দেখাটা তবু একতরফাই। আমিই ওনাকে দেখেছি। উনি দেখেননি। কেন দেখেননি ? সে কাহিনী অন্যদিন।

φ φ Ψ Ψ Δ Δ

মিথ হয়তো একটা আঁকা। সেরামিকের ওপর। অমোছ এক আঁকা। যা রোদে পেকে বা আগুনে পুড়ে আনস্তিক। তাকে হাজার ঘষেও তোলা যায় না। কিছুতেই তোলা যায় না। কিছুতেই তোলা যায়.....

শেষ বয়সে সাধারণত লোকে স্বচ্ছন্দকেদারার দাস হয়। নতুনকে এড়ায়। পিকাসো ঠিক উল্টো। ছবি-টবি ছেড়ে পড়লেন প্রিন্ট-মেকিং এবং তার চেয়েও বেশি সেরামিক নিয়ে। নিজে শিল্পী না হলেও এটা বোঝা কঠিন নয় যে সেরামিক নিয়ে কাজ করা ক্যানভাস-তুলির চেয়ে অপেক্ষাতর কঠিন। কেননা সেরামিক বস্তুটা একে শক্ত তায় ভঙ্গুর। কোনরকম নমনীয়তা তার নেই। খুব জোর দিলে ভেঙে গুঁড়ো হয় আবার যথেষ্ট জোর না পড়লে ক্ষয় না ভালো ক'রে। ৯০ বছর বয়সেও কিন্তু

পিকাসোর সেই বলশালিতা যেমন আছে তেমনি পেশিনিয়ন্ত্রণ। কখনো বুকের কাছে তুলে এনে যন্ত্র ঘষে ঘষে কাজ করছেন যখন, সাদা-নীল-সবুজ রাত-ফতুয়ার নিচে রীতিমতো ফুলে উঠছে পেশি। মনোহর আইচের কথা মনে না পড়লেও তার চেয়ে খুব দূরে নয় পিকাসো। সেরামিকশিল্পের আর একটা সুবিধে এই যে রঙ-তুলি সম্পূর্ণ বাদ পড়ে না, আঁকার কাজ থেকে যায়। সেরামিক নিয়ে পিকাসোর কাজ ও আগ্রহ কিন্তু নতুন নয় খুব। এর সূত্রপাত ৩০-এর দশকে প্রভাঁস অঞ্চলে কবি-বন্ধু পল এল্যুয়ারের সাথে বেড়াতে গিয়ে তারা হাজির হন ভালাউরিস (Vallauris) গ্রামে। সে গ্রামের মৃৎশিল্প বিখ্যাত, সেরামিক-শিল্পও। সেখানে পিকাসোর আলাপ হয়ে যায় এক মৃৎশিল্পী দম্পতির সাথে - রামিয়ে (Ramié) দম্পতি। ওঁদের 'মাদুরা' (Madoura) নাম্নী ওয়ার্কশপে পিকাসোর প্রথম কাজ। সেরামিক শিল্প প্রাচীন, অথচ চিত্রকর, ভাস্কররা এড়িয়ে গেছেন একে। আঁরি মাতিসের সাথে পিকাসোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা অজানা নয়; মাতিস মৃৎশিল্পের ওপর কিছু শিল্পকাজ শুরু করেছিলেন কিন্তু তা পিকাসোর সেরামিক-শিল্পের মতো তেমন মৌলিক ও ব্যপৃত নয়। এই সমস্ত কারণে সেরামিকশিল্প ছিলো পিকাসোর পক্ষে এক সুপ্রযোজ্য বৈচিত্র্য। শেষ বয়সে সেই চত্বরে ফিরে গেলেন আরো অনেক বেশি প্যাশন নিয়ে।

φ φ Ψ Ψ Δ Δ

মানুষের হাতে যে সময়ের কাদার তাল এসে পড়ে, হাত যা শ্রমে, মেধায়, আবেগে মননে গড়ে - সেটাই মিথ। আদিকাব্যের আখ্যানের মতো কেবল সে বহুত্বের রূপক, সমষ্টির প্রয়াসে গড়া, এককের নয়। আবার এও ঠিক যে প্রতিটি এককের আলাদা প্রয়াস তার চরিত্রের অন্তত একটা দানার স্রষ্টা। অসংখ্য মনের, ভাষ্যের, অভিসন্ধির অজস্র দানায় গড়া মিথ তাই দানাদার। গড়ে যেমন সহজে, সে ভাঙেও। আবার ভেঙে অন্য আকার নেয় ততোধিক সহজতায়।

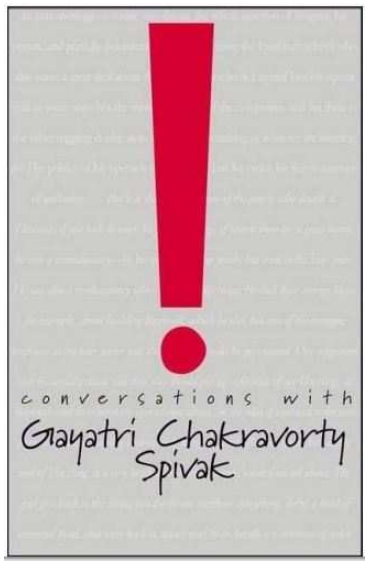


গায়ত্রী স্পিভাক বলতে থাকেন -

'বিনয় একেবারে শেষ যে সাক্ষাতকার দিয়েছিলো - আমাকে রাজনগর বাসস্ট্যান্ডে কে যেন দিয়েছিলো সেই কাগজটা - কেউ ওকে জিজ্ঞেস করেছিলেন শেষের দিকে, 'আপনি তো গায়ত্রী চক্রবর্তী সম্পর্কে কিছুই বললেন না।' কি বলবে সে ? আমার সঙ্গে কিছুই তো ছিলোনা তার। তাই সে হেসে বলেছিলো, 'আমি ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি আর গায়ত্রী ৫ ফুট ৯। যদি তোমরা ওর সম্বন্ধে কিছু ছাপতে চাও, এইটা ছেপো।' কাজেই ওইটুকুই.....৫ ফুট ৩ ইঞ্চির থেকে ৫ ফুট ৯ ইঞ্চির যতটা দূরত্ব, আমি বিনয়ের থেকে ততোটাই দূরে। আর একজনকে সে নাকি সম্প্রতি বলেছিলো, আমি পড়েছি, বলেছিলো,'গায়ত্রী চক্রবর্তী ইংরেজী সাহিত্যের নামী ছাত্রী ছিলো। আমার মনে হয় সে হয়তো আমার কবিতা ঠিক বুঝতে পারবে না।' এটা কিন্তু অসম্ভব মিষ্টি এক উক্তি। তুমি বুঝতে পারছো তো, এই রকম সব জিনিস ওর চোখ কাড়তো। এমনি বড়ো মনের সেই মানুষ।'

φ φ Ψ Ψ Δ Δ

নয় নয় করে অনেক প্রেমিক-প্রেমিকা এসেছেন। তাদেরই এক যুগল আমার পাশের সীটে। কোনো কোনো কবিতায় তারা চোখ চাওয়াচাওয়ি করেন, কখনো ভীষণ গাঢ় হয়ে উঠে একে অন্যের দিকে ঝোঁকেন, আঙুলের ফাঁসে আঙুল চালিয়ে মেরুণ শালের নীচে চালান করেন। আর আমি বেচারি একা নির্বান্ধবী রোম্যান্টিক সতেরো - গায়ে চোরকাঁটা দেয়।

সন্তোষকুমার ঘোষকে কিন্তু আমার একেবারেই চেনার কথা নয়। যেমন সৌমিত্র মিত্রকে সেদিন চিনতে পারিনি, পারিনি অভী সেনগুপ্তকে। কিন্তু বছর চারেক আগে ছোটোকাকার গানের স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে সন্তোষকুমার এসেছিলেন বিড়লা সভাঘরে। পাঠানো গাড়ি থেকে নেমেই বাবাকে দেখে বললেন, 'আরে মঞ্জু, কতদিন পর!' ; আর বাবা আমাকে নির্দেশ দিলেন - প্রণাম করো। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে সন্তোষকুমার ঘোষ বাবাকে প্রশ্ন করলেন, 'এক ছেলে না? বয়স কত? দশ?' এইরকমভাবে অচেনা লোকেরা প্রণাম নিয়ে যেতেন তখন। কি জ্বালা!

কিন্তু সেদিন সতের বছর বয়সে শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে ফাইন আর্টসের মঞ্চের ওপর লোকটা (সন্তোষকুমার ঘোষ) পরম স্নেহে বকা-ঠাট্টা দিচ্ছে দেখে সমীহ হলো। ইনি নিশ্চয় কেউকেটা কেউ। শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে মস্করা করছেন - বাপরে! সন্তোষকুমার বলছিলেন শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে - 'শক্তি কিন্তু আজ খুব সুভদ্র হয়ে আছে, ওর কত সব কবিতা আছে জানেন? লাজলজ্জা খসানো শব্দে ভরা। তেমন কবিতা কিন্তু একটাও পড়ছেনা।' এইসব কবিতারও কিছু তখন আমার মুখস্থ - 'যোনির মাড়ির খিল হাট করা' বা 'পড়ে আছে ফলমূল, স্বপ্নরাজ্য /কুকুরের বিচি' বা 'শিল্পের প্রস্রাবরসে পাকে গন্ড/ পাকে গুহ্যদেশ' এমনকি গঙ্গার ধারে অমিতাভ দাশগুপ্তর ধুতিতে আগুন লাগানোর ঘটনা নিয়ে লেখা 'পোঁদের জ্বালায় হু হু করতে করতে/ আমরা তিন উল্লুক কা-হাঁকা'ও পড়ে ফেলেছি। সে যুগে কেবল-টিভি থাকলে 'কৌন বনেগা শক্তি' অনুষ্ঠানে আমি নিঃসন্দেহে কিশোর পুরস্কার পেতাম। ফার্স্ট প্রাইজ।

একটা স্যুভেনির বেরিয়েছিলো সে সন্ধ্যায়। টিকিটের সঙ্গে এক কপি বিনামূল্যে। আলাদা পয়সায় বাড়তি কপিও পাওয়া যাচ্ছিলো। অবনীর অনুরোধ বারবার আসছে, এক সময় শক্তি কিছুটা বিরক্ত হয়ে শ্রোতাদের বললেন - 'মঞ্চে আমার মেয়ে বসে আছে, ও কিন্তু 'অবনী বাড়ি আছো' পড়লে উঠে চলে যাবে বলেছে।' কে শোনে কার কথা! শেষে পড়তেই হলো। এবং পড়ার শেষে সেই আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। 'অবনী'র অ্যানাটমি। এবং এটাও এস-কে-জি ছিলেন বলেই হলো।

φ φ Ψ Ψ Δ Δ

বেলা বাড়ছে, এগিয়ে যাচ্ছে সেরামিক শিল্প। হঠাৎ যারা ডকুমেন্টারি তুলছেন, সেই দলেরই এক কর্মীর ওপর ভয়ংকর চটে যাচ্ছেন পিকাসো। পরিচালক সীনটা কাটেন নি। ছবিতে ধরা পড়ছে ৯০ বছরের পিকাসোর মাংশাযী পেশিবহুল রাগ। চারপাশে ক্যামেরা, তার, যন্ত্রপাতি নিয়ে লোকজন আসা-যাওয়া করছে, তাতে মনোসংযোগ নষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়। আবার ঠান্ডা হয়ে বসলেন। ছেলেটিকে 'সরি' বললেন। কিছুক্ষণ পর আবার ক্ষেপে উঠলেন। এবার ছুঁড়ে ফেলে দিলেন নিজের হাতের কাজ। সজোরে। সেরামিক খন্ডটা মাটিতে পড়ে ভেঙে গেলো। অন্যের ওপর, এমনকি প্রেমিকা বা সন্তানের ওপর লোকটা যেমন নির্দয়, ততোটাই সে নিজের ওপর। ওই যে বর্জিত শিল্পের টুকরোগুলো মাটিতে পড়ে আছে, ওটাই হয়তো কোনো গরীব মানুষের সারাজীবনের বৃহত্তম সঞ্চয় হতে পারতো। প্রাইসলেস শেয়ার! শেয়ারবাজার মাথা নোয়াতো। কিন্তু পিকাসোর কাছে তা বর্জ্য, নির্মমভাবে তাকে ভেঙে ফেলেন। ক্ষেপে ওঠেন নিজের ওপর। বিড়বিড় করতে করতে পায়চারি করেন। এই শেষ স্ত্রী ঝাকলিনই সম্ভবত একমাত্র নারী যিনি পিকাসোকে সামলাতে পারতেন। স্ত্রী এগিয়ে এসে কথা বলতে থাকলেন। সেসব কথা ছবিতে নেই। দূরে আবছা হয়ে যায় ভাষ্যকারের বয়ানের পেছনে। আমি ভাষ্য শুনিনা, লোকটাকে দেখতে থাকি। যোগ ৯০ রাগী যুবক তখন আবার ব্যালকনিতে। পায়চারী করছেন। আর ভাবছেন। প্রবলভাবে ভাবছেন, গায়ের জোরে ভাবছেন। আবার ছুটে কাজের ঘরে ঢুকে বসে পড়ছেন স্টুলে। শুরু হয়ে যাচ্ছে ঘষামাজা।

একটা মিথের মুখোশ নয়, দেখতে পাচ্ছি তার রক্তমাংশ। দেখতে পাচ্ছি তার আটা, জল, বেলুন, তন্দুর। দেখতে দেখতে চোখে জল এসে যায়। নিজের সামান্যতা, শৈল্পিক অসহায়তা এই বৃদ্ধ-যুবার সামনে নটে গাছ হয়ে যায়, গুটিয়ে কেন্নো বা লজ্জাবতী। প্রতিভা আর সাধনা নামের দুই নারীর কথা মনে হয়। যারা হয়তো সমকামি। অনঙ্গ, একাত্ম। অশরীরী। তাদের

দুজনের অবাস্তব মিলনে যা দাঁড়ায় তারই হয়তো অন্য নাম পাবলো পিকাসো। অনুভূতির কতোটা তীব্রতা, কতোটা কঠিন পরিশ্রমে একটা শিল্পকীর্তি দাঁড়ায় সেটা চাক্ষুস হতে থাকে। বারবার নিজেকে বোঝাতে থাকি, এইভাবে লিখতে পারা চাই, নাহলে লেখার কোনো প্রয়োজন নেই। কোনো মানে নেই, কোনো সার্থকতা নেই। অনেক লেখার লোক আছে এ জগতে। আমার বাদ পড়ে গেলেও চলে।

φ φ Ψ Ψ Δ Δ

গায়ত্রী হঠাৎ বললেন - 'আমার কিন্তু মনে হয় 'অঘ্রাণের অনুভূতিমালা'র পর ও এমন কিছু লেখেনি যা ওটার চেয়েও উৎকৃষ্ট। 'অঘ্রাণের অনুভূতিমালা' আমার কাছে 'ফিরে এসো চাকা'র থেকে অনেক বেশী জোরালো। ....*বলোতো ২২,২৬,৩০ মাত্রায় এমন জোরালো কিছু আর কেউ কখনো লিখেছে? মা গো*! .... সেইটা বড় জিনিস, তার চেয়েও এই যে ওটা একটা নিখাদ দার্শনিক কবিতা। এপিস্টেমোলজির একটা এপিক বলা যায়, বাবা রে বাবা !

φ φ Ψ Ψ Δ Δ

একটু একটু করে শক্তি সবটা বললেন। বন্ধু মানব (মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) তখন খড়গপুরের হিজলি হাইস্কুলের বাংলা শিক্ষক। (৭৬ সালে প্রথম যাই খড়গপুরের হিজলিতে। আই-আই-টি ক্যামপাসে। একমাস ছিলাম প্রায়। চিড়িয়াখানার বাইরে সেই প্রথম সাপ দেখা।) শক্তি তাঁর ভাড়াবাড়ি না কোয়ার্টারে গিয়ে ওঠেন। (যাদবপুরের পড়ার সময়ে মানববাবুকে পরে অনেকবার দেখেছি এবং ভেবেছি এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করবো কিনা কিন্তু সাহসে কুলায় নি।) যাইহোক, সেই সন্ধ্যায় শক্তি বলছিলেন - 'ইস্কুলে যাবার আগে মানব বলে গিয়েছিলো কারো আসার সম্ভাবনা নেই, তবে ও ফিরবে বিকেলে। বাড়িতে কিছু খাবার দাবার ছিলো আর ছিলো প্রচুর মদ। দোতলার বারান্দায় গিয়ে বসেছিলাম। অদ্ভুত দিনটা ছিলো। বারবার বৃষ্টি পড়ে আর রোদ ওঠে। সামনের মাঠে রাখাল চরছিলো গরু নিয়ে। আর বৃষ্টি পড়ছিলো। আর মেঘ করছিলো। ওই ওখান থেকেই লাইনটা এলো - 'এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে', 'এখানে বৃষ্টি পড়ে বারোমাস'। .....' প্রায় উনত্রিশ বছর আগের সমস্ত কথা মনে নেই। এটুকু মনে আছে এস-কে-জি নানারকম প্রশ্ন করছিলেন শক্তিকে, একবার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও করলেন। শক্তি বলছিলেন - 'কয়েক ঘন্টা পর, কয়েক বোতল শেষ হয়ে গেছে, সে এক অদ্ভুত অবস্থা, জানি বিকেলের দিকে মানব ফিরবে, তখন ওকে দরজা খুলে দিতে হবে। তাই আধা-চেতনা বলছে মানব এসে গেছে, কে যেন দরজায় কড়া নাড়ছে, আবার অন্য আধখানা চারপাশের দৃশ্য বিধুর হয়ে আছে....'। 'বিধুর' শব্দটা শক্তি বলেছিলেন সেদিন, মনে আছে। ওই 'আধখানা চেতনা'র অনুভূতিতেই এসেছিলো 'আদেখলীন হৃদয় দূরগামী'র কথা। আমার ইচ্ছে হয়েছিলো জিজ্ঞেস করি 'সবুজ নালিঘাস' কেন ? ১৭ বছরের লাজুকতার শিবির থেকে বেরোতে পারিনি। জানিনা পরে শক্তি এসব নিয়ে কোথাও লিখেছিলেন কিনা, বা কোনো সাক্ষাতকারে.....।

φ φ Ψ Ψ Δ Δ

হরি, দিনতো গেলো না। তবু সন্ধ্যা হলো। কাজ শেষ হলো পিকাসোর। মানে করতেই হলো। ভোর সাড়ে ছটায় বসা শিল্পী সন্ধ্যা ছটায় উঠলেন। অবশ্য দুপুর তিনটে নাগাদ আরেক কাপ লেবু-চা খেলেন, আর একটা ফিনফিনে টোস্ট, সঙ্গে দুটো আঙুর, কিছু ব্লু-বেরী। সন্ধ্যা ছটায় কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠতে কষ্ট হলো। স্ত্রী এসে ধরে ওঠালেন। ক্যামেরা বাথরুমেও ঢুকলো। বাথটাবে শুয়ে শুয়ে রোমশ বুকের ওপর সাবান মাখতে মাখতে পিকাসোর মুখে তখন নানা কৌতুকের কথা। স্নান করে কি সুন্দর সাজলেন। শিস দিলেন। সাজানো ডিনার টেবিলে বসলেন। এই সময়ে প্রায় প্রতিদিন অতিথিরা আসেন। পিকাসো দেখা করেন। সেদিন সন্ধ্যায় এসেছেন এক ছবির ডিলার। পিকাসো হাজারো রঙ্গ-রসিকতা করেন তার সাথে। অনেক খাবার খান। সব কটাই একটু একটু আর সঙ্গে লাল সুরা। পুরনো দিনের কথা বলেন, কেমন করে একসময় মাতিসের সব ছবির দাম সম্বন্ধে ওর ১৬-আনা হুঁশ থাকতো .....এইসব। ডিলার ভদ্রলোকটি কি জানতে পারলেন আজ সারাদিন লোকটা কিভাবে কাটিয়েছে !

φ φ Ψ Ψ Δ Δ

গায়ত্রী অঘ্রাণে পড়ে থাকেন। এতটা ভাববিলাসী স্পিভাক বেশ অচেনা। বলতে থাকেন ভেঙে ভেঙে - সত্যিই অবিশ্বাস্য রকমের বইটা....অন্তত আমার কাছে....অঘ্রাণের অনুভূতিমালার পর 'ফিরে এসো চাকা'....লোকে যখন বলে জীবনানন্দের পরেই বিনয়, আমার সেটা খুব বাড়িয়ে বলা কথা বলে মনে হয়না....আমার কাছে 'ফিরে এসো চাকা' 'অঘ্রাণের অনুভূতিমালা'র সমগোত্রীয় নয়। একেবারেই না। ওটা এক অবিশ্বাস্য বই....it was something else

φ φ Ψ Ψ Δ Δ

মিথিকাল কবিতার সেই মিথভাঙা রচনা-ইতিহাস আমার মনে অন্য মিথ হয়ে রয়ে গেছে। শক্তির ভূত ঘাড় থেকে নামতে আরো বেশ কয়েক বছর লেগেছিলো। একবার নিউ-এম্পায়ার সিনেমা থেকে 'গন উইথ দ্য উইন্ড' শো-য়ের পর ওঁকে বেরোতে দেখে আবার এক রাউন্ড অনুসরণ করেছিলাম। তবে ঐ সন্ধ্যার প্রায় ৯ বছর পর ১৯৯০ সালে কৌরব পত্রিকার ৫৪ নং সংখ্যা দিতে গিয়ে আনন্দবাজার অফিসে শক্তির সঙ্গে আমার প্রথম পারস্পরিক দেখা-আলাপ হয় ; সেদিন শক্তি বেশ মুডে ছিলেন। পাশের রাস্তায় তখনো মেট্রো-রেলের খোঁড়াখুঁড়ি। তারই একপাশে এক চায়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ অচেনা অল্পবয়সী ছেলেটিকে চা খাইয়েছিলেন। অনেকক্ষণ গল্প করেন। এবং সেদিন শক্তি নিজের কথার বদলে বারেবারে অন্য একজন কবির কথা বলেছিলেন - স্বদেশ সেন।